দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনে

পরীক্ষা পদ্ধতির কম্পিউটারায়ন ও সমস্যার নতুন প্রকরণ

শাহ্ মোঃ নূরুল ইসলাম

১৯৯৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোর নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগকে। এটা নিঃসন্দেহে একটা উন্নত পদ্ধতি। একবারেই উভয় গণপরীক্ষায় এই পদ্ধতি শুরু করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়াটা আরও নিঃসন্দেহে সাহসের ব্যাপার। কিন্তু কাজটি করতে গিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বিপদে পড়বে বা শত শত স্কুল-কলেজ বিপদগ্রস্ত হবে এমন তো আশা করা যায় না। শিক্ষা বোর্ডগুলোর কার্যক্রম রীতি কখনোই অনমনীয় নয়। বোধ করি শিক্ষা বোর্ডে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যাসমূহ যেমন উপলব্ধি করতে পারেন তেমন উপলব্ধি তাঁদের উপরের নীতি প্রণয়নকারীদের না থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিবছর দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে নীতি নির্ধারকগণ যথেষ্ট কঠিন শর্ত আরোপ করে রেখেছেন। অবশ্য শর্তগুলো পূরণ করে কোন স্কুল বা কলেজ করা হলে তার মানটি ভাল হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসব শর্ত পূরণ করতে যথেষ্ট সময় লাগে। শর্তগুলো ক্রমশঃই পূরণ হতে থাকে আর সে অনুসারে শিক্ষা বোর্ডগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ছাড় দিতে থাকে। যেহেতু বেসরকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু বোর্ডগুলো মঞ্জুরী বা স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে যথেষ্ট নমনীয় হয়ে থাকে। দরিদ্র ও নিরক্ষর এই দেশটিতে এমন নমনীয় ধারণা না থাকলে সকল শর্ত পূরণ করে কোন প্রতিষ্ঠানই একবারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না। শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে বা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনেক সময় উৎসাহও প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে থাকে। এমন বহু প্রতিষ্ঠানই চলছে সেগুলোতে শর্ত অনুযায়ী খেলার মাঠ হয়নি, পাঠাগার হয়নি, ঘরদোর পাকা করা হয়নি। তবুও সেখানে পাঠদান চলছে। পরীক্ষাও দিচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা। তারা গণপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণও হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার মত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকবৃন্দ কষ্ট করে শিক্ষার কাজ চালাচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা লাভ করছে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর সহযোগিতায় অনেক সময়েই বহু প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের পরও ছাত্র-ছাত্রীদের নিবন্ধন করতে পারে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে পারে। এমনও দেখা গেছে, পরীক্ষা আরম্ভ হবার স্বল্পদিন আগেও নিবন্ধন করিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। নানা কারণে তাদের নিবন্ধন বিলম্বিত হয়। পরীক্ষা ফরম পূরণেও বিলম্ব হয়ে যায়। পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টিও অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। যাঁরা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেন, তাঁরা অনেকগুলো শর্ত পূরণ করতে বাধ্য হন। স্বাভাবিক আবেদন, বোর্ডের তদন্তের আগে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, প্রশাসনিক সমর্থন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিশ্চয়তা, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাকালে আবাসিক ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের সিট সুষ্ঠুভাবে বসানোর নিশ্চয়তা ইত্যাদি নানা দিকে তাঁদের বহু প্রস্তুতিমূলক কাজ থাকে। এসব কাজ করতে করতে এবং শিক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেতে যথেষ্ট সময় লাগে। অনেক সময়ই পরীক্ষা আরম্ভের ১০/১৫ দিন আগেও চূড়ান্তভাবে কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কোন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনকে কখনোই কোন বিলাসিতা মনে করা যায় না। কেন্দ্র স্থাপনের গুরুত্ব না থাকলে বা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন না থাকলে কেউ কেন্দ্র বরাদ্দ করেন না বা কেউ আবেদনও করেন না। গ্রামভিত্তিক বলে কথিত বাংলাদেশের গ্রামের স্কুল ও কলেজে এই বিষয়টিকে কখনোই হেলা করা যায় না। শহরে বসবাসকারীরা এবং সচ্ছল ব্যক্তিরা এই বিষয়টিকে বোঝার মত খুব কমজনেই স্বস্তিগ্র।

আমরা জানি যে, গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্মই হয়ে থাকে তাদের স্থানীয় সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য। তাঁরা শহরে যেতে পারে না। তেমন অর্থ-বল নেই। অনেকি পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। স্থানীয়ভাবে একটি স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তারা তাদের সীমিত শক্তির সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। তাঁরা সে জন্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নমনীয় মনোভাব পাবার অধিকার পেতে পারে। পরীক্ষা দেবার সুযোগও তাদের একইভাবে পাওয়া উচিত। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং খোদ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও দ্বিমত পোষণ করবেন না। কিন্তু ১৯৯৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে নমনীয়তার সুযোগ দান বিষয়টি কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক পরীক্ষা মে মাসে (৯৪) এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা জুলাই মাসে (৯৪) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই পরীক্ষা দু'টির জন্য পরীক্ষার বিষয়প্রতি ফিস্‌ও এই বছর যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরীক্ষাকে কম্পিউটারায়ন করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ বলে সংশ্লিষ্ট মহল হতে জানা গেছে। পরীক্ষার বৃদ্ধি করা এই ফিসকে যথারীতি ছাত্র-ছাত্রীরা পরিশোধ করে পরীক্ষা ফরম পূরণ করছে। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার ফিস্ প্রদান করার পরই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারে যে, তার ছাত্র সংখ্যার চূড়ান্ত সংখ্যা কত। ফরম পূরণের পরই কেবল সাব্যস্ত করা সম্ভব যে, কোন কেন্দ্রে কোন প্রতিষ্ঠান যুক্ত হবে বা কোথায়ও কোন কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা দরকার কি-না? যদি কোন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র প্রয়োজন বোধ করে, বিধিমত আবেদন করে- কেবল তখনই শিক্ষা বোর্ড তা পরীক্ষা করে নিয়ে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। প্রতিবছর প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ডগুলো তাদের নিজস্ব কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক কমিটির সভায় কেন্দ্র তালিকা, উপকেন্দ্র তালিকা চূড়ান্ত করে থাকে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এই প্রথাটিই জানা আছে। ঐ পরীক্ষা কেন্দ্র বিষয়ক কমিটিটি বিগত পরীক্ষার মধ্যে কোন কেন্দ্র অনিয়ম করেছে বা আইন-শৃংখলা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে তাও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়া হবে কি-না বা তাকে কিছু বিষয় আরও সতর্ক হতে হবে কি-না জানিয়ে দেয়া হয়। যোগাযোগ করে জানা গেছে, ১৯৯৪ সালের পরীক্ষা কেন্দ্র বিষয়ের কমিটি কোন বৈঠকে বসেনি। ফলে কেন্দ্র স্থাপনের কোন আবেদনের ওপর কোন বিবেচনা করা হয়নি এবং বিগত পরীক্ষায় কোন কেন্দ্র কি অনিয়ম করেছে বা আইন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়নি। শুধুমাত্র বিগত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রগুলোকে পূর্ণাংগ কেন্দ্র হিসাবে একটা তালিকা প্রস্তুত করে তা ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রসেস করার জন্য বা কোর্ড নম্বরের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণমুখী সরকারী নীতির ফলে এবং জনগণের বিশেষ উদ্যোগে বহু প্রতিষ্ঠান হতে এ বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বহু স্থানে নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

আশ্চর্যজনকভাবে ছাত্র-ছাত্রীর চূড়ান্ত সংখ্যা অর্থাৎ ফরম পূরণ করার বা ঐ ফরম শিক্ষা বোর্ডে জমা হবার পূর্বেই কেন্দ্র তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আর কোন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না মর্মে মৌখিকভাবে জানিয়েও দেয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় পরীক্ষা নেয়া হলে দেশের গ্রাম অঞ্চলের শত শত স্কুল-কলেজের হাজার হাজার গরীব ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। এটা হবে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলের সবচেয়ে বড় ধরনের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। সরকারী দলের কথা ও কাজের মধ্যকার দুই বিপরীত ইচ্ছার প্রতিফলন।

অনেকের প্রশ্ন যে, কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে। কম্পিউটারের প্রয়োজনে তো মানুষকে ব্যবহার করার কথা নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, কম্পিউটারের প্রয়োজনে মানুষকে বলি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

চলবে